সরকার, রাজস্ব বিভাগ ও করদাতা — এ তিনের স্বার্থের মিলন সম্ভাবনার সন্ধানে!

বছর পেড়িয়ে আবারো নতুন বাজেট ঘোষনার সময় এসেছে। করনীতি নিয়ে প্রায়শই আলোচনা হয়; তবে কর-আদায়ের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অভিযোগ সর্বাধিক। এতদাসত্বেও কর-আদায়ের নীতি প্রসঙ্গে কদাচিৎ আলোচনা হয়। প্রথমেই উল্লেখ্য যে, সরকারের করনীতি ও কর-আদায়ের নীতির সম্পর্ক ও ভিন্নতার স্বচ্ছতা আনা প্রয়োজন; এবং তার আলোকে জাতীয় রাজস্ব বিভাগের ভূমিকা স্পষ্ট করা প্রয়োজন। একজন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানিক পর্যায়ের করদাতা হিসেবে এ প্রেক্ষিতে প্রত্যক্ষ কর-আদায় প্রসঙ্গে আমার কিছু প্রস্তাবনা নিম্নে উল্লেখ করলাম।

রাষ্ট্রের চরিত্র যাই হোক না কেন, তার ব্যবস্থাপনার জন্য অর্থ প্রয়োজন। হীরকের খনি বাইরে বিক্রী করে অথবা অন্য কোন লাভজনক সম্পদ নিজের ব্যবস্থাপনায় রেখে, অথবা প্রজাদের (বা নাগরিকদের) উপর করারোপ করে সে অর্থের যোগান হতে পারে। মানব সমাজের আদিকাল থেকেই এসব ব্যবস্থার উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে; এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই পদাস্ফলনের বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। হীরকের রাজা প্রশাসনের প্রতি অবহেলা করে ব্যক্তি ভোগ-বিলাসে অধিক মনযোগী ছিল। তেমনি, তুঘলকী আমলে জমির খাজনা ফসলের অর্ধেক থেকে বৃদ্ধি করে দুই-তৃতীয়াংশ করলে প্রজাগণকে জঙ্গলে পালাতে হয়েছিল, যার ফলশ্রুতিতে কোষাগার শূণ্য হতে বসেছিল। অপরদিকে, দিল্লীর সম্রাটের প্রতিনিধি হয়ে খাজনা তুলতে এসে অনেকেই বিদ্রোহ ঘোষণা করে স্বতন্ত্র রাজ্য সৃষ্টির মাধ্যমে সেই খাজনার উপর একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়েছিল। এতসব কাহিনী ও জনজীবন-অস্থিতিকারী ঘটনা স্বত্বেও এটা অনস্বীকার্য যে সুষ্ঠ নাগরিক-জীবন নিশ্চিত করতে প্রশাসন আবশ্যিক এবং তার রক্ষনাবেক্ষনের জন্য অনেক ক্ষেত্রেই জন-সাধারনকেই অর্থ সরবরাহ করতে হবে। সরকার, নাগরিক ও (মধ্যস্বত্বভোগী বা) রাজস্ব-আদায়কারী সংস্থার মধ্যকার সম্পর্কে কোথাও ফাটল ধরলে, এই ব্যবস্থাপনা বিপন্ন হবে যা সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করতে পারে। তাই রাজস্ব-বৃদ্ধির উপায় অথবা কর-ফাঁকি রোধের উপায় বের করতে সম্ভাব্য করদাতার স্বার্থ বিবেচনায় আনতে ব্যর্থ হলে টেকসই ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এজাতীয় উদ্যোগের পূর্বে নীতি-নির্ধারকদের প্রতিষ্ঠানিক পর্যায়ের সামষ্টিক কিছু দিক ভেবে দেখার অনুরোধ করবো।

কর আদায় প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানিক খাত থেকে সরকারের হাতে সম্পদের স্থানান্তর ঘটে; যা বরাবরই প্রশাসনের ব্যয়ভার নির্বাহে ও বিনিয়োগে যৌক্তিকতা পায়। তবে নীতি নির্ধারকেরা কর-কাঠামোকে হাতিয়ার হিসেবেও ব্যবহার করেন — বিশেষত, বাজারের ব্যর্থতার কারণে সৃষ্ট অদক্ষতা দূর করতে অথবা সার্বিক রাজস্ব নীতির আলোকে সামাজিক বৈষম্য দূর করতে। অনেক সময় সেই হাতিয়ার অর্থনীতিক প্রবৃদ্ধি তরান্বিত করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়, যা সরকারী বন্টন নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নাও হতে পারে। এসবের বাইরেও রাজনৈতিক স্বার্থ-সিদ্ধির লক্ষে আমাদের সমাজে কর-সংক্রান্ত তথ্যের অপব্যবহার হতে দেখা গেছে। এসবের প্রেক্ষাপটে তিনটি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে এ নিবন্ধের আলোচনা সীমিত থাকবে — রাষ্ট্রীয়খাত নিরপেক্ষ নয় বিধায় সরকারের কর-আয় বৃদ্ধির প্রস্তাবনা সতর্কতার সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন; কর-আদায়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তির চাইতে প্রতিষ্ঠানকে অধিকতর টার্গেট করার যৌক্তিকতা; এবং কিছু ছোট-খাটো অনিয়ম দূর করার প্রস্তাবনা যার প্রয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের নৈতিক দৃঢ়তা সংস্কারের প্রাথমিক মনোবল যোগাতে সহায়ক হবে।

কর-সংগ্রহে টার্গেট বনাম প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিকে করজালের আওতায় আনার টার্গেট

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক ও জনসাধারনের মাঝে যে প্রয়োগকারী সংস্থা রয়েছে, তাদেরকে উদ্যোগী করতে অনেক সময় টার্গেট বেঁধে দেয়ার রীতি বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে দেখা যায়। যেমন, ব্যাংক কর্মকর্তাদের নির্দিষ্ট পরিমাণ সঞ্চয় সংগ্রহ ও ঋণ বিতরন করতে হয়; ট্রাফিক পুলিশকে ফি আদায় করতে হয়, ইত্যাদি। একইভাবে, কর-কর্মকর্তাদের ন্যুনতম পরিমাণ কর-আদায়ের মাত্রা বেঁধে দেয়া ও সেই পরিমানের অধিক কর-সংগ্রহ হলে

তার উপর প্রনোদন দেয়ার চল শুরু হয়েছে বলে শুনেছি। এজাতীয় পদক্ষেপের অন্তরালে কর-সংগ্রহের পরিমান সর্বাধিক করার উদ্দেশ্য কাজ করে। প্রশ্ন হলোঃ একটি কর-আদায়কারী প্রতিষ্ঠানের জন্য এজাতীয় লক্ষ থাকা কাম্য কি?

জনসাধারন অর্থনীতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে যে সম্পদ সৃষ্টি করে তার অংশ বিশেষ নিজেদের ভোগের জন্য ব্যয় হয়, কিছু অংশ নতুন সম্পদ সৃষ্টির লক্ষে বিনিয়োগে ব্যয় হয় অথবা ব্যক্তি-সঞ্চয়ের পথ বেয়ে অন্যদের মাধ্যমে বিনিয়োগ হয়, এবং এর কিয়দাংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কর হিসেবে সমাজ-ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারের ভরন-পোষণে খরচ হয়। অনেক ক্ষেত্রে রাজস্ব-প্রাপ্তি বিনিয়োগে রূপান্তর করার দায়িত্বে সরকার অবতীর্ণ হয়। জনগনের স্বার্থ রক্ষার্থে এবং যৌক্তিকতার বিচারে নিঃসন্দেহে কোন্ কোন্ খাতে সরকারী ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন, কি ধরনের ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন, তার আকার-পরিধি কি হবে, এবং সরকারী বিনিয়োগের পরিমান কি হওয়া উচিত - এ সবই আলোচনায় এনে জন-অর্থনীতির কি পরিমাণ সম্পদ কর হিসেবে হস্তান্তর হবে, তা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। সরকারী ব্যয়ের কার্যকারীতার নিরিখে এবং জন-অর্থনীতি থেকে সম্পদ স্থানান্তরের নেতিবাচক প্রভাবের আলোকে নীতি পর্যায়ে সার্বিক লক্ষমাত্রা ঠিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। এজাতীয় সিদ্ধান্ত কর-আদায়কারী সংস্থার এক্তিয়ারভুক্ত হওয়া উচিত নয়। কর-আদায়ের ক্ষেত্রে প্রশ্ন হওয়া উচিত, প্রচলিত কর-কাঠামোতে যাদের প্রত্যক্ষ কর দেয়ার কথা, তারা সেটা দিচ্ছে কিনা। সেটা করতে গিয়ে একদিকে যেমন সৎ ও আগ্রহী করদাতাদের হয়রানী যেন না হয়, তেমনি অসৎভাবে যারা করফাঁকি দিচ্ছে, তাদের সাথে কর-কর্মকর্তারা যেন অনাকাঙ্খিত যোগসাজশ না ঘটে। যদি কর-কর্মকর্তাদের অসাধুতার কারণে প্রত্যক্ষ কর-আদায়ের পরিমাণ কম হয়, উপরোল্লেখিত প্রণোদনা দিয়ে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির সম্ভাবনা কম। বরং, কর্মকর্তা-প্রতি কর-আদায়ের লক্ষমাত্রা বেঁধে দিলে তার অপপ্রয়োগ হবার সভাবনা থাকে এবং নানা অজুহাতে সৎ করদাতাদের হয়রানী করে লক্ষমাত্রা পূরণের প্রবণতা দেখা যেতে পারে। বিকল্প হিসেবে করজালে নিবন্ধন করার লক্ষমাত্রা (সম্ভাব্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যাদের আইনানুগ ভাবে কর দেয়া উচিত) অধিক কাম্য - প্রস্তাবিত দ্বিতীয় বিষয়টি আলোচনার পর এবিষয় সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা থাকবে।

ব্যক্তি বনাম প্রতিষ্ঠানঃ কর আদায়ের লক্ষবস্তু কি হওয়া উচিত?

করদাতা হিসেবে যতদূর জানি, বর্তমান কর-আদায় পদ্ধতিতে কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের (প্রকল্প সহ) কাছ থেকে কর-আদায় যারা করেন, তারা ব্যক্তির কাছ থেকে কর-আদায়ের বিষয় দেখেন না। এটা অনস্বীকার্য যে আমাদের সমাজের অনেকেই প্রতিষ্ঠান-কেন্দ্রিক উপার্জন কর্মকান্ডে লিপ্ত নয়। তথাপি, কর-দাতাদের অধিকাংশই কোন না কোন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে মালিক বা বেতনভোগী কর্মচারী হিসেবে কর্মরত আছেন। এসব ব্যক্তিদের প্রাথমিকভাবে করজালে নিবন্ধিত করা এবং পরবর্তীতে নিয়মিত কর-দাখিল করতে উৎসাহিত করবার জন্য প্রতিষ্ঠান-কেন্দ্রিক নজরদারী জোরদার করা প্রয়োজন। এই প্রস্তাবনার পক্ষে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করবোঃ

- আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে একজন ব্যক্তি করদাতার তুলনায় সাধারনত একজন কর-কর্মকর্তা অধিক ক্ষমতাবান হওয়ায় স্বেচ্ছাচারীতার সম্ভাবনা অধিক। এবং অনস্বীকার্য যে ব্যক্তি পর্যায়ে অবৈধ লেন-দেনের সুযোগ বেশী। সেই তুলনায় একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে বোঝাপড়া করতে হলে, নির্দিষ্ট কর্মকর্তাকে প্রতিষ্ঠানিক নীতিমালার আশ্রয় নিতে হবে এবং অন্যান্য সহকর্মীদের সহায়তা নিতে হবে।
- আমরা আশা করি যে পর্যায়ক্রমে প্রত্যক্ষ কর-সংক্রান্ত তথ্যাদি কম্পিউটারে মজুদ করা হবে, যা প্রয়োজনে বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি যাচাইয়ের সুযোগ এনে দিবে। যত বেশী প্রতিষ্ঠান করজালে নিবন্ধিত হবে এবং তাদের দ্বারা ব্যক্তিকে দেয় সম্মানী/বেতন সংক্রান্ত তথ্যাদি পাওয়া যাবে, তত বেশী ব্যক্তি-পর্যায়ে কর দাখিল নিশ্চিত সম্ভব হবে।

- প্রতিটি ব্যক্তির পেছনে লেগে থাকতে যে লোকবল ও অর্থের প্রয়োজন, তার চাইতে অনেক কম লোকবল ও অর্থ দিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলোকে করজালে আনা সম্ভব ও তাদের মাধ্যমে করযোগ্য ব্যক্তিদের অধিক সম্পদশালী অংশ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব।

পূর্বের আলোচনার সূত্রধরে বলবো, কর-কর্মকর্তাদের জন্য ঘোষিত প্রণোদনা যেন কে কয়টি প্রতিষ্ঠানকে করজালে আবদ্ধ করলো তার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। এরফলে, প্রত্যক্ষ কর-আদায়ের ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা পাবে – কর্মকর্তাদের প্রণোদনা-ভিত্তিক আয় বৃদ্ধি পাবে, মোট রাজস্ব আয় বৃদ্ধির ভিত্তি তৈরী হবে, এবং সর্বোপরি, সৎ করদাতাদের হয়রানী কমে করফাঁকি দেয়া ব্যক্তিদের করজালে আবদ্ধ করবে। আমাদের দেশের নীত-নির্ধারকগণ এটাই কি চান না?

অতিরিক্ত কিছু প্রস্তাবনা

পরিশেষে, ব্যক্তির উপর সরাসরি আরোপিত কর আদায়ের ব্যবস্থা উন্নত করার ক্ষেত্রে কিছু প্রস্তাবনা। পরিসরের স্বল্পতার কারণে সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করছিঃ

- প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের জন্য আয়-ব্যয়ের হিসাব দাখিল করা এবং সেইসাথে প্রতিষ্ঠান-কর্তৃক ব্যক্তিকে দেয় বেতন/সম্মানী সংশ্লিষ্ট সকল তথ্যাদি দেয়া বাধ্যতামূলক করা।
- উৎসে আগাম কর-কর্তন সম্পর্কে বিধিমালা স্পষ্ট করা প্রয়োজন। একইসাথে, চালান জমা দেয়ার ফর্মে বেতন/সম্মানী-প্রাপ্তদের উপর সুনির্দিষ্ট তথ্যাদি থাকা বাঞ্ছনীয়।
- কর-জালের আওতায় আনার অর্থ এই নয় যে একজনকে কর দিতেই হবে। এ কারণে কর-দাখিলকারী প্রতিটি ব্যক্তির জন্য ন্যুনতম কর ধার্য্য করা অনুচিত। বিশেষত, কর-যোগ্য আয়ের নীচের সীমা যেখানে বেঁধে দেয়া হয়েছে, ব্যক্তি-প্রতি কর ধার্য্য নিঃসন্দেহে অসঙ্গতিপূর্ণ। এবং এজাতীয় ভাবনাহীন নীতি স্বল্প-মেয়াদে রাজস্ব বৃদ্ধি করতে সক্ষম হলেও দীর্ঘমেয়াদে তা ক্ষতিকারক।
- দুঃখজনক হলেও সত্য যে আমাদের দেশের সরকার ব্যক্তির অধিকারের প্রতি প্রায়শই শ্রদ্ধাশীল নয় এবং কারো পক্ষে অতিরিক্ত কর জমা পড়লে তা ফেরত পাওয়া প্রায় অসম্ভব। এমতাবস্থায়, ১০% করের (যা করযোগ্য ন্যুনতম আয়ের অধিকের উপর প্রযোজ্য) আয়সীমার কথা খেয়াল রেখে উৎসে আগাম কর-কর্তনের ক্ষেত্রে তিনটি বিভাজন বিবেচনাযোগ্য – যারা মাসিক ১৫,০০০ টাকা বা তার কম পাবেন তাদের ক্ষেত্রে কর্তন হবে না; যারা মাসিক ১৫,০০০ থেকে ৩৫,০০০ টাকা পাবেন তাদের ক্ষেত্রে ৫%; এবং যারা ৩৫,০০০ টাকার উর্ধে পাবেন তাদের জন্য ১০% উৎসে আগাম কর-কর্তন চালু রাখা।
- দেশী-বিদেশী সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য উপরোক্ত নিয়ম বাধ্যতামূলক হওয়া প্রয়োজন। এবং দেশী, বিদেশী ও বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত সকল বিদেশী নাগরিক যারা এসকল প্রতিষ্ঠান থেকে সম্মানী/বেতন পেয়ে থাকেন, তাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রযোজ্য হওয়া প্রয়োজন। এব্যাপারে বাছ-বিচার করার জন্য করজালে ফাঁক তৈরী হয়। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে আজকের যুগে যেখানে দাতা-নামক প্রতিষ্ঠানও বাণিজ্যিক কর্মে লিপ্ত এবং সকলেই যখন শেষ বিচারে বেতন-ভোগী, বেশ কিছু বিদেশী প্রতিষ্ঠানকে করমুক্ত রাখায় (সেবাধর্মী) শ্রমবাজারে বিকৃতির জন্ম দিয়েছে। উপরন্তু, এজাতীয় সুবিধা দেয়ার ফলে কর-আদায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা দুরূহ হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ সরকারের (বহিঃসম্পদ বিভাগ) সাথে ঋণ-দানকারী সংস্থাসমূহের যে কর-অবমুক্তির চুক্তি রয়েছে তার পুনর্মূল্যায়ণ হওয়া জরুরী।
- পরিশেষে উল্লেখ্য যে, প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বতঃপ্রণোদিতভাবে যেন তথ্য সরবরাহ করে, এজন্য কিছু উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট একটি বিষয় দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচনায় আনতে বলবো। আমাদের দেশের লিমিটেড কোম্পানীকে মুনাফার উপর বড় অংকের কর দেয়ার কথা এবং কর-পরবর্তী ডিভিডেন্ড-কে ব্যক্তি আয় গণ্য করে দ্বিতীয় দফায় কোম্পানী'র মালিকদের কর দেয়ার

কথা। এ বিষয়ে যারা মাঠ-গবেষণা করেছেন তাদের ধারণা যে, এই করের বোঝার কারণে অধিকাংশ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান হিসেবের মারপ্যাঁচে মুনাফা দেখায় না; এবং অনেকক্ষেত্রে এমনও অভিযোগ উঠে যে এজাতীয় অনিয়মে কর-প্রশাসনের কারো কারো সক্রিয় সহযোগীতা রয়েছে। বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সমূহকে তথ্য প্রদানে উৎসাহিত করতে কর-কাঠামো'র পুনর্মূল্যায়ণ হওয়া আবশ্যিক।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে প্রতিষ্ঠান-বহির্ভূত ব্যক্তিদের করজালের আওতায় আনার বিষয়টি পরিসরের অভাবে আলোচনা সম্ভব হয়নি।

সাজ্জাদ জহির
পরিচালক, ইকনমিক রিসার্চ গ্রুপ
sajjad@ergonline.org
ঢাকা, ১লা মে ২০১০